গণতন্ত্রের আন্দোলন

ওপর সভা-সমিতিতে যোগ দেয়া আর আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। প্রায় তিন সপ্তাহ অনেক অনুরোধ-উপরোধের পর বিচারপতি আবু সায়ীদ চৌধুরী আমাদের আন্দোলনের ফ্রন্ট লিডার হতে রাজি হলেন। তবে এ শর্তে যে, মিডিয়া-সম্পর্কের দায়িত্ব আমাকেই বহন করে যেতে হবে।

সত্তরের নভেম্বরে পূর্ব পাকিস্তানের দক্ষিণ উপকূল অঞ্চলের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় পাঁচ লাখ লোক মারা গিয়েছিল। ত্রাণসাহায্যের জন্য চাঁদা তুলতে যুক্তরাজ্যের বহু শহর-নগরে পূর্ব পাকিস্তানিরা বাংলাদেশ সমিতি গঠন করেছিলেন। পঁচিশে মার্চের পরে এই সমিতিগুলো আবার সক্রিয় হয়ে উঠল। তারা বিচ্ছিন্নভাবে নিজ নিজ শহরে মিছিল, সভা ইত্যাদি করে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে জনমত সংগ্রহের কাজ শুরু করে দেন। আবু সায়ীদ চৌধুরী এসব সমিতির মধ্যে লিয়াজোঁ স্থাপন করেন। লন্ডন বার্মিংহামসহ প্রতিটি বড় শহরে তারা কয়েকটি বড় সমাবেশ ও মিছিল করেছেন। এ দিকে চৌধুরী সাহেব একাধিক টেলিভিশন সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। পার্লামেন্ট সদস্য, হাইকোর্টের বিচারপতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রমুখ প্রভাবশালী ব্যক্তির সাথে দেখা করে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি ও কার্যকারণ বিশেষণ করেছেন। আমার প্রেস ব্রিফিংয়েও দু-তিনবার এসেছিলেন তিনি।

হতাশ হওয়ার কারণ ঘটেনি

এসবের ফলে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্বজনমত গড়ে উঠেছিল। স্বাধীনতার পরে অনেকেই আমাকে বলেছিলেন, বিশ্বব্যাপী প্রবল জনমত গড়ে ওঠায় আমাদের স্বাধীনতা লাভ অন্তত দুই বছর এগিয়ে এসেছিল। একই সাথে আমরা ভারতে নির্বাসিত অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের জন্য কূটনৈতিক স্বীকৃতি সংগ্রহেরও প্রবল প্রচেষ্টা করেছি। এখানে সাফল্য ছিল সীমিত। ব্রিটেনসহ প্রায় সব দেশ আমাদের বলেছে, মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীনতার একটা কনসেপ্ট (ধারণা) মাত্র। কনসেপ্টকে সমর্থন দেয়া যায় কিন্তু স্বীকৃতি দেয়া যায় না। যে দেশের মাটিতে কর্তৃত্ব যে শক্তি বা সংগঠনের হাতে, স্বাভাবিক কূটনৈতিক রীতি অনুযায়ী স্বীকৃতি তাদেরকেই দিতে হবে।

একের পর এক, বিভিন্ন দেশের সরকারপ্রধান বিগত কিছু দিনে শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন, তার প্রশাসনের সাথে কাজ করার অঙ্গীকার দিচ্ছেন। অথচ এই সরকারগুলো আওয়ামী লীগের একদলীয় 'সেমসাইড' নির্বাচনে পর্যবেক্ষক পাঠাতে অস্বীকার করেছে; আজ অবধি বলে যাচ্ছে যে, নির্বাচন বিশ্বাসযোগ্য কিংবা গ্রহণযোগ্য হয়নি। মে-জুনের মধ্যেই সবার অংশগ্রহণে আরেকটি স্বচ্ছ নির্বাচনের দাবি তারা জানিয়ে আসছেন। ইউরোপীয় পার্লামেন্ট ও যুক্তরাজ্য পার্লামেন্ট আনুষ্ঠানিকভাবে যথাসত্বর সবার গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করার তাগিদ দিয়েছে। এই আপাতবিরোধিতার কারণটা একটু আগেই বুঝিয়ে বলা হলো। সুতরাং বাংলাদেশের গণতন্ত্রকামীদের হতাশ হওয়ার বিশেষ কারণ ঘটেনি।

কেউ কোথাও সরকারের স্বেচ্ছাচারসুলভ কাজকর্মের সমালোচনা করলেই সরকারের দলীয়কৃত পুলিশ, র‌্যাব কিংবা সশস্ত্র ক্যাডার তাদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে এবং তারা শহীদ রুমি ও নিজামুদ্দিন আহমেদের মতোই নিরুদ্দেশ হয়ে যাচ্ছেন। তাদের কারো কারো লাশ এখানে-সেখানে পড়ে থাকতে দেখা যায়। বিএনপি ও জামায়াতসহ ১৮ দলীয় নেতাদের বেশির ভাগ এখন জেলে এবং রিমান্ডে দলিত-মথিত হচ্ছেন। যারা বাইরে আছেন, তাদের অনেকে প্রাণভয়ে কোনো মতে আত্মগোপন করে আছেন।

এমন মিডিয়াভীতির কারণ কী?

দেশের মানুষ গণতন্ত্র চায়, তারা এই স্বেচ্ছাতন্ত্র থেকে নাজাত চায়, নিষ্কৃতি চায়। মার্কিন রাষ্ট্রদূত ড্যান মজিনা নতুন নির্বাচন দাবি করে যাচ্ছেন। সে কারণে জেনারেল সফিউলাহ দাবি করছেন, তাকে বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত করতে হবে। জেনারেল সফিউলাহকে চিনতে পেরেছেন আপনারা? ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তিনি ছিলেন বাংলাদেশের সেনাপ্রধান। তিনি তার বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেননি। সে কালরাত্রিতে প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান টেলিফোন করে তার কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন। সফিউলাহ অপারগতা প্রকাশ করে তাকে পেছনের দরোজা দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এখন একটা পেশিশক্তিনির্ভর সরকার গদি দখল করে আছে বলে তারা বীরদর্পে গলাবাজি করছেন। একাত্তরের মতোই দেশের ভেতরের খবরও আর বাংলাদেশের মানুষকে জানতে দেয়া হচ্ছে না। সরকারের জনতাভীতি এমনই সাংঘাতিক। টকশো নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নাখোশ হয়েছিলেন। চ্যানেল ওয়ান টেলিভিশন বন্ধ করে দেয়া হলো। শাহবাগ মঞ্চের হোতা কয়েকজন আলাহ, রাসূল সাঃ আর ইসলামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে বগ প্রচার করছিল। সে খবর ফাঁস করে দেয়ার কারণে মাহমুদুর রহমানকে তার অফিস থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। আজো তিনি বিনা বিচারে কারাবন্দী এবং মাঝে মধ্যে তাকে রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারপতির স্কাইপ কেলেঙ্কারির খবর ফাঁস করে দেয়ার কারণে আমার দেশ পত্রিকার ছাপাখানায় তালা লাগিয়ে পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়া হয়। লক্ষণীয় যে, আমার দেশে প্রকাশিত খবরগুলো মিথ্যা ছিল বলে সরকারও দাবি করতে পারেনি। সেসব খবর প্রকাশিত হওয়ায় সরকার বিব্রত হয়েছিল, বেকায়দায় পড়েছিল। আমার দেশ বন্ধ করে দেয়া হয় সে কারণে।

মে মাসের ৫ তারিখে হেফাজতে ইসলাম শাপলা চত্বরে সমাবেশ ডেকেছিল। কয়েক লাখ লোক সমবেত হন সেখানে। সরকারের পোষ্য মিডিয়াগুলো চোখের মাথা খেয়ে বসেছিল। এই জনসমুদ্রকে তারা খবর বলে বিবেচনা করেনি। ইসলামিক টেলিভিশন আর দিগন্ত টেলিভিশন সে সমাবেশকে সংবাদ বলে বিবেচনা করেছিল, সমাবেশের চিত্র প্রদর্শন করছিল তারা। সম্প্রচারের মাঝপথেই এ দু'টি টেলিভিশন চ্যানেল বন্ধ করে দেয়া হয়। এখন আবার ইনকিলাব পত্রিকার ছাপাখানায় তালা লাগানো হয়েছে, বার্তা সম্পাদকসহ তিনজন সাংবাদিককে গ্রেফতার করা হয়েছে। আমি উনিশ শ' ত্রিশের দশকের জার্মানি কিংবা একাত্তরের বাংলাদেশের কথা বলছি না। আমি বলছি, একবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের বাংলাদেশের কথা।

ভারতীয় কূটনৈতিক অপপ্রচার

কী করবে এখন বিএনপি? গোড়ায় কূটনৈতিক সমর্থনের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা দেখিয়ে এবং জিরিয়ে জিরিয়ে আন্দোলন করতে গিয়ে বিএনপি ভুল করেছিল। এখন বিদেশীদের ওপর সে নির্ভরশীলতা পরিত্যাগ করা সম্ভব নয়। কিন্তু তাই বলে আন্দোলনে ভাটা দিলে কূটনীতিকদের গরজও কমে যাবে। অর্থাৎ এক দিকে কূটনীতিকদের সুযোগ দিতে হবে। একই সাথে আন্দোলনও চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু সরকারের বুলডোজার নীতির কারণে আন্দোলনের কৌশলে পরিবর্তন আনতে হবে।

বিদেশী সরকারপ্রধানেরা শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। কিন্তু একই সাথে তারা ইঙ্গিতে-ইশারায় জানিয়ে দিচ্ছেন, বর্তমান গোঁয়াতুর্মির পথ আঁকড়ে থাকলে বিদেশী ঋণ ও সাহায্য হ্রাস পেতে থাকবে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন বলে দিচ্ছে, বাংলাদেশের পোশাক ও অন্যান্য পণ্য রফতানিতে জিএসপি সুবিধা তারা হয়তো আর দেবে না বর্তমান সরকারকে। ওদিকে বিদেশে শ্রমিক রফতানি বিগত তিন-চার বছরে অর্ধেক হয়ে গেছে। রেমিট্যান্স অনেক পড়ে গেছে, আরো পড়ে যেতে বাধ্য। এসব বিদেশী কূটনৈতিক চাপ অব্যাহত থাকলে শেখ হাসিনাকে অবশ্যই নতি স্বীকার করতে হবে। সরকার ও দেশ চালানোর মতো (এবং মন্ত্রীদের বিশ্বজোড়া ভ্রমণের জন্য) যথেষ্ট অর্থসাহায্য তার পৃষ্ঠপোষকেরা তাকে দেবে না।

কিন্তু সরকারের ওপর থেকে কূটনৈতিক চাপ হ্রাস করতে ভারতীয় কূটনীতিকেরা বিশ্বজোড়া তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছেন। তারা বিদেশীদের বোঝানোর চেষ্টা করছেন যে, জামায়াতে ইসলামী প্রকৃতই একটা সন্ত্রাসী দল, তাদের সহায়তায় বিএনপি শেখ হাসিনার গণতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের মানুষ জানে, বিএনপির আন্দোলনে হামলা করে সহিংস ঘটনা ঘটিয়েছে পুলিশ এবং আওয়ামী লীগের সশস্ত্র ক্যাডাররা। আওয়ামী লীগের কর্মীরাই অনেক স্থানে পরিকল্পিতভাবে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা করে বিএনপি-জামায়াতের ওপর দোষ চাপানোর চেষ্টা করছে।

কিন্তু ভারতীয় কূটনীতিকেরা বিদেশীদের বোঝাচ্ছেন সম্পূর্ণ উল্টো। তারা বিদেশী সরকারগুলোকে বোঝাতে চাইছেন যে, বিএনপি-জামায়াতের সন্ত্রাস বন্ধ করতে হলে শেখ হাসিনার কঠোর শাসনকে গদিতে রাখতেই হবে। ভারতের এসব তৎপরতার কিছু ফলও লক্ষ করা যাচ্ছে। সে ভরসাতেই সরকারের মন্ত্রীরা বাগাড়ম্বর শুরু করে দিয়েছেন। তারা এখন বলছেন, পুরো পাঁচ বছরই তারা গদিতে থাকবেন। এ দিকে, উপজেলা নির্বাচন ইত্যাদি দিয়ে সরকার তাদের ক্ষমতা সংহত করার সর্বাত্মক চেষ্টা শুরু করে দিয়েছে।

আন্দোলনের পরিবর্তিত লক্ষ্য

এই বিদেশী কূটনৈতিক চাপ অব্যাহত রাখা এবং ভারতীয় কূটনীতিকদের অপপ্রচার অকার্যকর করে দেয়া বিএনপির আন্দোলনের অন্যতম প্রধান দিক হওয়া উচিত। দেশের মানুষ গণতন্ত্র চায়। বিএনপির আন্দোলনের ভ্রান্ত কৌশলের কারণে কিছুকাল তাদের সমর্থন ফিকে হয়ে এসেছিল। কিন্তু ৫ জানুয়ারির নির্বাচন সফলভাবে বয়কট করে জনগণ প্রমাণ দিয়েছে যে, তাদের সমর্থন এখনো খালেদা জিয়ার প্রতি। বিএনপির যেসব নেতাকে সরকার জেলে পুরে রেখেছে, তাদের সত্বর মুক্তি দেয়া হবে বলে আশা করা যায় না। গ্রেফতারের এবং বিচারবহির্ভূত হত্যার ভয়ে যারা গাঢাকা দিয়ে আছেন, তাদের সাহস সঞ্চয় করে বেরিয়ে আসতে হবে। সরকার যদি তাদের গ্রেফতার করে, সেটাও আন্দোলনকে বেগবান করে তুলবে। আগেই বলেছি, জনগণ আন্দোলনের সাথে আছে। তারা শুধু নিশ্চিত হতে চায়, নেতারা তাদের সাথে আছেন, তারা কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করছেন না, ত্যাগ স্বীকার করতে পিছপা হচ্ছেন না।

বেগম জিয়ার ওপর জনতার বিশ্বাস অটুট আছে। একটানা ১৫ দিন গৃহবন্দী দশায় থেকেও যেভাবে তিনি আন্দোলনকে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন, যেভাবে সেমসাইড নির্বাচন বর্জন করতে তাদের উদ্দীপনা দিয়েছেন, তাতে তার প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা বেড়ে গেছে। কিন্তু দেশে ও বিদেশে এত বড় একটা আন্দোলন পরিচালনা করা এককভাবে তার পক্ষে কঠিন হবে। বিএনপির যে নেতারা অবিশ্বস্ত নন তাদের অবশ্যই এবং অবিলম্বে শত ঝুঁকি সত্ত্বেও আন্দোলনে নেমে আসতে হবে।

খালেদা জিয়া অজগ্রবার বলেছেন, তিনি শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চান। কিন্তু শান্তি রক্ষা সম্পূণরূপে তার কিংবা তার দলের এখতিয়ার নেই। দলীয়কৃত পুলিশ এবং আওয়ামী লীগের সশস্ত্র ক্যাডারেরা আন্দোলনে বাধা দিচ্ছে, মানুষ খুন করছে। ১৯৭২-৭৫ সালে রক্ষীবাহিনী ৪০ হাজার বিরোধী নেতাকর্মীকে হত্যা করেছিল। এ পরিস্থিতি এখন আবার দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন স্থানে বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের লাশ পড়ে থাকছে। আসাদুজ্জামান নূরের নির্বাচনী মিছিলে হামলা হয়েছিল, সে রকম হামলা বাংলাদেশে অতীতেও হয়েছে। এসব হামলার নজির সৃষ্টি হয়েছিল ১৯৭৩ সাল থেকে।

কিন্তু নূরের মিছিলে হামলার দায়ে অভিযুক্ত বিএনপি ও ছাত্রদলের দু'জন স্থানীয় নেতার লাশ পরপর দুই দিনে গত সোমবার পর্যন্ত পাওয়া গেছে। সরকারের প্রচারযন্ত্রগুলো তারস্বরে তাদের অপরাধের দায় চাপাচ্ছে আন্দোলনের এবং বিএনপির ওপর। সম্প্রতি তো দফায় দফায় প্রমাণ পাওয়া গেছে, সরকারের লোকেরা হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন-নিপীড়ন চালাচ্ছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতারাও বলছেন সে কথা। কিন্তু সরকারের পোষ্য এবং ভারতীয় মিডিয়া বিএনপি ও জামায়াতের ওপর একতরফা দোষারোপ করছে। বিএনপিকে এখন এসব অপপ্রচারের মোকাবেলা করতে হবে। আন্দোলনের চেয়েও অসহযোগের ওপর বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। দেশবাসীকে বোঝাতে হবে, এই সরকারের অবস্থান কতটা জনবিচ্ছিন্ন।

তারেকের ভূমিকার প্রয়োজন এখন তীব্র

একই সাথে লন্ডন, নিউ ইয়র্ক, মাদ্রিদ প্রভৃতি রাজধানী থেকে বিএনপির কর্মী ও সমর্থকদের ভারতীয় অপপ্রচার প্রতিরোধের চেষ্টা চালাতে হবে। সুগঠিতভাবে আন্দোলন করে সংশিষ্ট দেশগুলোর সরকারকে প্রকৃত পরিস্থিতি জানিয়ে দিতে হবে। সামাজিক মিডিয়ার কল্যাণে দেশের সত্যিকারের খবর চাপা দিয়ে রাখা সরকারের পক্ষে আর সম্ভব নয়। আমরা একাত্তরে যে সমস্যার মোকাবেলা করেছি, সে সমস্যা এখন আর নেই। বাংলাদেশ থেকে সঠিক খবর ও তথ্যাদি সংগ্রহ করে সব দেশের সরকার ও মিডিয়ার হাতে পৌঁছে দিতে হবে।

বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমান কয়েক বছর ধরে লন্ডনে আছেন। শুনেছি, অনেক কর্মীর আনাগোনাও আছে তার কাছে। আইটিতে (তথ্যপ্রযুক্তি) দক্ষ এবং মিডিয়াবান্ধব উৎসাহী কর্মীদের সাহায্যে তিনি সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করে বিভিন্ন দেশের মিডিয়া এবং সরকারের পররাষ্ট্র দফতরে নিয়মিত পাঠানোর ব্যবস্থা করতে পারেন। বিদেশে এখন তারেকের প্রতিষ্ঠা আছে। তিনি মিডিয়ায় সাক্ষাৎকার দিয়ে, সম্পাদকদের সাথে ঘরোয়া বৈঠক করে, বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানের সাথে দেখা করে বাংলাদেশের প্রকৃত পরিস্থিতি এবং সমস্যা-সঙ্কটের কথা তাদের বুঝিয়ে বলতে পারেন। বর্তমান সরকার এবং তাদের মুরব্বিদের সমবেত আন্দোলন প্রতিহত করার দায়িত্ব সম্পূণরূপে চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার ওপর ছেড়ে দেয়া অবিবেচনাপ্রসূত কাজ হবে।

লেখক: বিবিসি বাংলা বিভাগের সাবেক প্রধান

হিন্দুস্থানী রিমোট

২০০৪ সাল থেকেই ইনকিলাব শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের পক্ষে প্রকাশ্যে অবস্থান নেন। ইনকিলাবের প্রতিষ্ঠা কালীন থেকে সেখানে কর্মে থাকা অনেক সাংবাদিককে বাধ্যতা মূলক ছুটির নামে অপসারণ করা হয়। তাদের জায়গায় নিয়োগ দেয়া কট্টর আওয়ামী পন্থি সাংবাদিকদের। সেই কট্টর আওয়ামী পন্থি সাংবাদিকদের নেতৃত্বে ইনকিলাব সম্পাদক এ এম এম বাহাউদ্দিন, নির্বাহী সম্পাদক রুহুল আমিন খান সহ একটি প্রতিনিধি দল ২০০৪ সালের জুন মাসে শেখ হাসিনার সঙ্গে সুধা সদনে সাক্ষাৎ করেন। তখন থেকেই শেখ হাসিনার সঙ্গে ইনকিলাবের দহররম মহররম ছিল। কিন্তু এত দহররম মহররমের পরও সিলগালা হল ইনকিলাবের ছাপাখানা। এই ঘটনা থেকে ওয়ান ওয়ে রাজনীতির অশুভ ইঙ্গিত দেয়া হয় জাতিকে। যার সঙ্গে যত দহরম মহররম-ই থাকুক ওয়ান ওয়ে রাজনীতির কোন সমালোচনা করা যাবে না। সাফ জানিয়ে দেয়া হল ইনকিলাব ছাপাখানা সিলগালা করার মাধ্যমে।

এর আগে দৈনিক আমার দেশকে ২০১০ সালের ১ জুন একবার বন্ধ করা হয়। তখন আইনি লড়াই করে আবার প্রকাশনায় ফিরে আসে আমার দেশ। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। ২০১৩ সালের ১১ এপ্রিল আবারো কৌশলে বন্ধ করা হয় আমার দেশ। ২০১০ সালের মত আর ভূল করেনি। এবার সরাসরি পুলিশি অ্যাকশন। ছাপা খানায় তালা লাগিয়ে দেয়া হল। বাইরে কোথায়ও ছাপতে দেয়া হচ্ছে না। একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় ইনকিলাবের ক্ষেত্রে। ইনকিলাবেও ছাপা খানায় তালা ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে মাত্র। ডিক্লারেশনে কোন রকমের ঝামেলায় যাওয়া হয়নি। ডিক্লারেশন ঝামেলায় গেলে আইনি লড়াইয়ের সুযোগ থাকে। এখানে সোজা সাফটা জোর যার মুল্লুক তার। পুলিশ প্রেসে তালা ঝলিয়ে দিল। ব্যাস, এক ওষুধে রোগ সারা।

সেই একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে দিগন্ত টেলিভিশন এবং ইসলামিক টেলিভিশনের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ ওয়ান ওয়েতে চলার পথে বিঘ্ন হতে পারে এমন কিছু রাখা হবে না। টার্গেট কিলিং গুলো এখন আর জাতির সামনে সেই ভাবে আসছে না। বরং উল্টা রাজনৈতিক সহিংসতার গল্প ছড়ানো হচ্ছে হিন্দুস্থান পন্থি আওয়ামী-বাম মিডিয়া গুলোতে।

ওয়ান ওয়ে রাজনীতির আরেক কৌশল হলো উপজেলা নির্বাচন। হানিমুন পিরিয়ডে সরকার উপজেলা নির্বাচন সেরে নিতে চায়। দেখে শুনে যা মনে হচ্ছে জাতীয় নির্বাচনে না গেলেও উপজেলা নির্বাচনে অসহায় আত্মসমর্পনের পথে যাচ্ছে ১৮ দলীয় জোট। সেই প্রস্তুতি শুরু হয়েছে প্রতিটি উপজেলায়। যদিও ১৮ দলীয় জোটের পক্ষ থেকে কোন আনুষ্ঠানিক ঘোষনা আসেনি এখনো। সব মিলিয়ে ওয়ান ওয়ে রাজনীতি দেশকে কোন দিকে নিয়ে যায় সেটা দেখার অপেক্ষা ছাড়া এখন আর কোন বিকল্প আপাতত নেই।

দরগাহ মাদ্রাসার দস্তারবন্দী সম্মেলন ২৫-২৭ ডিসেম্বর

জামেয়া কাসিমুল উলুম দরগাহে হযরত শাহজালাল(রঃ) এর ৪০ সালা দস্তারবন্দী সম্মেলন (সমাবর্তন) আগামী ২৫, ২৬ ও ২৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। সিলেট সরকারি আলীয়া মাদ্রাসা মাঠে অনুষ্ঠেয় এ সম্মেলনে দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা আলেম-উলামা অংশ নেবেন।

রোববার সিলেট প্রেসকাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান জামেয়ার প্রিন্সিপাল মুফতি আবুল কালাম জাকারিয়া। এ সময় জামেয়ার শায়খুল হাদীস মুফতি মুহিবুল হক উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, দস্তারবন্দী সম্মেলন ৬, ৭ ও ৮ ফেব্র"য়ারি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু, দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনায় জামেয়ার মজলিসে শুরার সিদ্ধান্তক্রমে এ তারিখ পরিবর্তন করা হয়েছে। সম্মেলন সফলের জন্য ৮০ লাখ টাকার বাজেটও ঘোষণা করা হয়েছে। লিখিত বক্তব্যে জামেয়াকে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিা প্রতিষ্ঠান হিসাবে উলেখ করে বলা হয়, দস্তারববন্দী সম্মেলনে প্রায় শিা সমাপনকারী দেড় হাজার আলেম অংশ নেবেন।